



শুক্রবার • ২৩ অক্টোবর ২০২৬ • পেজ ৮

শহরজুড়ে যখন শারদোৎসবের প্রস্তুতি চলছিল, তখন বাঙালির মনে উঁকি দেয় শৈশবের পূজো, মণ্ডপের আলো, নতুন জামাকাপড় আর বাড়ির রান্নার পরিচিত গন্ধ। কারও কাছে দুর্গাপূজো মানে রাতভর মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বেড়ানো, কারও কাছে অষ্টমীর অঞ্জলি কিংবা দশমীর সিঁদুরখেলা। আবার কারও কাছে পূজোর অর্থ নিজের শিকড়ের কাছে ফিরে যাওয়া। অভিনেত্রী পাওলি দামের কাছেও দুর্গাপূজো শুধুমাত্র উৎসব নয়, বাঙালি পরিচয়, শিল্প-ঐতিহ্য, নারীশক্তি এবং মানবতার উদযাপন। পূজোর মণ্ডপে শিল্পীদের সৃজনশীলতা থেকে শৈশবের কলকাতা, ঢাকাই জামদানি থেকে শোলার পোশাক, মাছের ঝোল থেকে কলকাতার ঝালমুড়ি; পূজোর নানা অনুষ্ঠে নিজের ভাললাগা, স্মৃতি ও দর্শনের কথা ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী।



ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

বাঙালির কাছে দুর্গাপূজো অত্যন্ত আবেগের উৎসব। আপনার কাছে পূজোর অর্থ কী? সময়ের সঙ্গে সেই অর্থে কি কোনও বদল এসেছে? **পাওলি:** দুর্গাপূজো এমন একটা আবেগ, যা পৃথিবীর যে প্রান্তেই বাঙালি থাকুন না কেন, সারা জীবন তাঁর সঙ্গে থেকে যায়। তবে কলকাতার পূজো শুধু আবেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শিল্পকুশলতা, কারিগরি এবং অসংখ্য মানুষের সম্মিলিত পরিশ্রম। সারা বছর ধরে পরিকল্পনা চলে। প্রতিটি মণ্ডপের নিজস্ব পরিচয় থাকে। কোথাও বিষয়ভিত্তিক পূজো, কোথাও সার্বকিয়ানা। শোলার ব্যবহার আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরম্পরার পরিচয় বহন করে। আমরা এমন এক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বাস করি, যেখানে মহিলাদের প্রতিনিয়ত নিজেদের অস্তিত্বের জন্য লড়াতে হয়। অথচ সেই সমাজই দেবী দুর্গার আরাধনা করে। এই বৈপরীত্য আমাকে ভাবায়। আমার কাছে দুর্গাপূজো নারীশক্তির জয়ের প্রতীক, যদিও বাস্তবে আমরা সব সময় তার তাৎপর্য উপলব্ধি করি না। পূজোর রং, উদ্দীপনা আর কন্ঠবাস্তবতার মধ্যে একটা নিজস্ব ছন্দ রয়েছে। বাইরে থেকে যেটাকে বিশৃঙ্খলা মনে হয়, আমার কাছে সেটাও যেন এক ধরনের সংগীত। এটাই দুর্গাপূজোর সৌন্দর্য।

শৈশবের পূজোর কোন স্মৃতিগুলি আজও আপনার মনে বিশেষ জায়গা করে রয়েছে? **পাওলি:** বৌধ পরিবারে বড় হয়েছি। ছোটবেলায় পোশাক বাছাইয়ের ধরন কেমন? কোন বিষয়টি একটি পূজোর সাজকে স্মরণীয় করে তোলে? **পাওলি:** পূজোর ফ্যাশনে আমি বরাবরই ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিই। প্রায় দু’দশক ধরে কাজ করছি, তবু পোশাকের পছন্দে আমি বেশ সাবেকি। আর আমার সবচেয়ে প্রিয় পোশাক শাড়ি। দিনের যে কোনও সময়, যে কোনও অনুষ্ঠানে শাড়ি পরতে আমার আপত্তি নেই। বাড়ির কাজ করা থেকে বাজারে যাওয়া, এমনকি গম্ফ খেলাও শাড়ি পরে সম্ভব! শাড়ি পরে গম্ফ খেলার ফোঁটোশুটও করছি। আমার কাছে শাড়ি শুধু সাজের পোশাক নয়, বরং পরিচয়ের একটা অংশ। তাই পূজোয় শাড়ি ছাড়া অন্য কিছু পরার কথা ভাবতেই পারি না।

পোশাক বাছার ক্ষেত্রে আবহাওয়ার দিকও নজর রাখি। দিনের স্লোয় মিহি মসলিন, সূতির শাড়ি কিংবা লিনেন আমার পছন্দ। সন্ধ্যের দিকে আবহাওয়া একটু ঠান্ডা হলে সিদ্ধ পরতে ভাল লাগে। আরামদায়ক, নরম এবং সহজে বাতাস চলাচল করতে পারে, এমন কাপড়ই বরাবর পছন্দ করি। ঢাকাই জামদানির প্রতিও আমার বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। বাংলাদেশের কয়েকজন পরিচালক বিভিন্ন সময়ে আমাকে জামদানি উপহার দিয়েছেন। নানা

কিছুটা পার্থক্য চোখে পড়ে। আসলে কলকাতার প্রতিটি এলাকার পূজোর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই বৈচিত্র্যকে কাছ থেকে দেখা, নতুন কিছু আবিষ্কার করা; এই আনন্দটাই আমার কাছে পূজো ঘোরার অন্যতম আকর্ষণ। মণ্ডপ ঘোরার ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক পূজো, না কি বনেদি বাড়ির সাবেকি পূজো; কোনটি আপনাকে বেশি আকর্ষণ করে? **পাওলি:** আমার কাছে পূজোর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ শিল্পকুশলতা। ছোটবেলা থেকেই অবাক হয়ে দেখতাম, কী ভাবে এক একটি মণ্ডপ অন্যটির থেকে আলাদা হয়ে ওঠে। একটা মণ্ডপ দেখে মনে হত, এটাই চাই! আবার অন্য মণ্ডপে গিয়ে মনে হত, না, এটাও তো দারুণ সুন্দর!

এখন পূজোর বিচারক হিসেবে কাজ করার সুবাদে প্রতিযোগিতার দিকটাও বুঝতে পারি। ছোটবেলায় অবশ্য সে সব মায়ায় থাকত না। মণ্ডপের সৌন্দর্য উপভোগ করাটাই ছিল আসল। বিষয়ভিত্তিক পূজো হোক, সাবেকি আয়োজন কিংবা শক্তিপূজো; প্রতিটি ধারারই নিজস্ব আকর্ষণ রয়েছে। তবে শোলার কাজ আমার বিশেষ পছন্দের। আমার মনে হয়, এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পমাহামকে কাজে লাগানোর আরও অনেক সুযোগ রয়েছে। শোলার মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে, তা এখনও পুরোপুরি ব্যবহার করা হয়নি। বাংলায় এই শিল্পকে ঘিরে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হোক, এটিই চাই। দিল্লির এক ডিজাইনারের তৈরি শোলার পোশাকও আমার সংগ্রহে রয়েছে। শোলার মতো ঐতিহ্যবাহী উপকরণকে আধুনিক পোশাকে আরও বেশি করে ব্যবহার করা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু নতুন ভাবনা আর সৃজনশীলতার।

সাবেকি শাড়ি থেকে আধুনিক সাজ; পূজোর ফ্যাশনে অনেক বদল এসেছে। আপনার পূজোর পোশাক বাছাইয়ের ধরন কেমন? **পাওলি:** পূজোর সাজকে স্মরণীয় করে তোলে? **পাওলি:** পূজোর ফ্যাশনে আমি বরাবরই ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিই। প্রায় দু’দশক ধরে কাজ করছি, তবু পোশাকের পছন্দে আমি বেশ সাবেকি। আর আমার সবচেয়ে প্রিয় পোশাক শাড়ি। দিনের যে কোনও সময়, যে কোনও অনুষ্ঠানে শাড়ি পরতে আমার আপত্তি নেই। বাড়ির কাজ করা থেকে বাজারে যাওয়া, এমনকি গম্ফ খেলাও শাড়ি পরে সম্ভব! শাড়ি পরে গম্ফ খেলার ফোঁটোশুটও করছি। আমার কাছে শাড়ি শুধু সাজের পোশাক নয়, বরং পরিচয়ের একটা অংশ। তাই পূজোয় শাড়ি ছাড়া অন্য কিছু পরার কথা ভাবতেই পারি না।

পোশাক বাছার ক্ষেত্রে আবহাওয়ার দিকও নজর রাখি। দিনের স্লোয় মিহি মসলিন, সূতির শাড়ি কিংবা লিনেন আমার পছন্দ। সন্ধ্যের দিকে আবহাওয়া একটু ঠান্ডা হলে সিদ্ধ পরতে ভাল লাগে। আরামদায়ক, নরম এবং সহজে বাতাস চলাচল করতে পারে, এমন কাপড়ই বরাবর পছন্দ করি।

ঢাকাই জামদানির প্রতিও আমার বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। বাংলাদেশের কয়েকজন পরিচালক বিভিন্ন সময়ে আমাকে জামদানি উপহার দিয়েছেন। নানা

পূজো মানেই শিকড়ের টান: পাওলি দাম

রঙের জামদানি রয়েছে আমার সংগ্রহে। পরতেও ভীষণ ভাল লাগে। এ ছাড়া লখনউয়ের চিকনকারি কাজের পোশাকও আমার পছন্দের তালিকায় রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী এই বস্ত্রগুলির নিজস্ব একটা সৌন্দর্য রয়েছে, যা সাজে অনায়াসেই অন্য মাত্রা যোগ করে। পূজোর সাজের সঙ্গে কী ধরনের গয়না পরতে পছন্দ করেন? আপনার সাজে কি বরাবরই মিনিমালিজম বা স্বল্প অলঙ্কারের প্রাধান্য থাকে? **পাওলি:** সাজের ক্ষেত্রে আমি বরাবরই মিনিমালিজমে বিশ্বাসী। হয় শাড়ি নজর কাড়বে, নয়তো গয়না সাজকে অন্য মাত্রা দেবে। দুটো একসঙ্গে খুব ভারী হয়ে গেলে আমার ভাল লাগে না। এমনও অনেক সময় হয়, একেবারেই গয়না পরি না।

তবে মিনিমাল সাজেও একটি আংটি, একজোড়া কানের দুল কিংবা একটি হার স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে। আমি খুব বেশি হার পরি না। বড় কানের দুল পরলে সাধারণত হার এড়িয়ে যাই। আবার ছোট দুল বা স্টাড পরলে কখনও হার পরতে ভাল লাগে। কয়েক সপ্তাহ আগে একটি অনুষ্ঠানে আইভরি রঙের ঢাকাই জামদানি পরেছিলাম। শাড়িতে রূপোলি, রোঞ্জ ও সোনালি সুতার কাজ ছিল। সঙ্গে ছিল পাল্লা ও হিরের মতো দেখতে পাথর বসানো একটি হার এবং ছোট কানের দুল। গোটা সাজে হারটিই ছিল মূল আকর্ষণ। শাড়ির সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে না গিয়ে গয়নাটি সাজকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছিল। আমি কখনও চাই না, গয়না শাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিক। সাজে অভিজ্ঞতা আর সংযমের মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকা জরুরি। রাজকীয় সাজের কথা উঠলে গায়ত্রী দেবী ও ডায়ানার কথা মনে পড়ে। তাঁদের সাজ ছিল মজিত, অথচ ব্যক্তিত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত জাঁকজমক ছাড়াও কী ভাবে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠা যায়, তাঁদের সাজ তারই উদাহরণ। আমিও এমন সাজ পছন্দ করি, যা রাজকীয় ও পরিমীলিত, অথচ অনায়াস।

বাঙালির উৎসবের সঙ্গে খাবারের সম্পর্ক অবিচ্ছেনা। বাড়ির পূজোর কোন স্বাদগুলি আপনাকে সবচেয়ে বেশি নস্টালজিক করে তোলে? **পাওলি:** খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে বাঙালি আর জাপানি; দুই ধরনের রান্নাই আমার সবচেয়ে প্রিয়। অথচ দু’দেশের খাবারের ধরন একেবারেই আলাদা। বাঙালি খাবারের কথা উঠলে অবশ্য মাছের প্রসঙ্গ আসবেই। পূজোয় মাছ খাওয়া আমার কাছে প্রায় বাধ্যতামূলক। আর ইলিশ হলে তো কথাই নেই! উৎসবের মরসুমে ইলিশ পেলে মনটাই ভাল হয়ে যায়।

বাঙালি নিরামিষ রান্নারও কিন্তু বিপুল বৈচিত্র্য রয়েছে। মোচা, খেড়, কচুর লতি দিয়ে কত রকমের পদ তৈরি হয়! পনিরকে সাধারণত উত্তর ভারতীয় রান্নার সঙ্গে জুড়ে দেখা হলেও বাঙালি রান্নার নিজস্ব স্বাদ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আলু পোস্ত আর কড়াই ডাল আমার খুব প্রিয়। বাঙালি রান্নার এমন অনেক পদ মেরেছে, যেগুলির স্বাদ একবার মুখে লেগে গেলে ভোলা যায় না।

মিষ্টির প্রতি অবশ্য আমার বিশেষ আকর্ষণ নেই। এই পেশায় আসার পর মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাস আরও কমেছে। তবে নোনতা খাবারের ক্ষেত্রে পছন্দের তালিকা বেশ লম্বা। ফিশ ফ্রাই, মাছের ঝোল, মাছের নানা পদ তো রয়েছেই। মোচার ঘন্ট আর ঘোকার ডালনাও আমার খুব প্রিয়।

সাধারণত খুব বেশি তেল-মশলাযুক্ত খাবার খেতে ভালবাসি না। তবে বিয়েবাড়ির খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটাই আলাদা। সেখানে খাবারের স্বাদ থেকে পরিবেশ; সব মিলিয়ে অভিজ্ঞতাটাও অন্য রকম। দু’ধরনের পদই রাখব। কারণ, সকলের পছন্দ তো এক নয়! তবে একটা বিষয় নিশ্চিত, আমার তৈরি খাবারে চিৎড়ি থাকবে না। আমি চিৎড়িতে অ্যালার্জিক।

কুমড়া ভাজা, বেগুন ভাজাও আমার খুব পছন্দের। আর পাস্তা ভাতের কথা আলাদা করে বলতেই হয়। ভাজা বেগুন, আলু, শুকনো লঙ্কা আর পেরোজা ভাজার সঙ্গে পাস্তা ভাত পেলে আমার আর কিছু চাই না। সামান্য সর্ষের তেল মিশিয়ে পাস্তা ভাত খেলেই মন ভরে যায়। চলচ্চিত্র জগতের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নিয়ে ঘরোয়া পূজোর মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করলে আপনার মেনুতে কী কী থাকবে? **পাওলি:** মধ্যাহ্নভোজের মেনুতে নিরামিষ ও আমিষ, দু’ধরনের পদই রাখব। কারণ, সকলের পছন্দ তো এক নয়! তবে একটা বিষয় নিশ্চিত, আমার তৈরি খাবারে চিৎড়ি থাকবে না। আমি চিৎড়িতে অ্যালার্জিক।

মেনু খুব জটিল করার পক্ষপাতী নই। বরং

পরিচিত বাঙালি পদেই বৈচিত্র্য রাখতে চাই। ভাজা মুগ ডাল, একটি সবজির পদ আর নানা রকমের ভাজা থাকবে। নিরামিষ ও আমিষ; দু’ধরনের ভাজাই রাখা যেতে পারে।

মাছ ছাড়া বাঙালির ভোজ জমে নাকি! তাই রুই, দই কাতলা আর ফিশ ফ্রাই অবশ্যই থাকবে। সঙ্গে ছানার বড়ার ঝোলের মতো পদও রাখা যায়। মুরগির মাংসের পাশাপাশি চাই একেবারে বাঙালি কায়দায় রান্না করা মটরন কারি। তাতে রসুন আর আলু থাকতেই হবে।

চাটনির ক্ষেত্রেও চাই একটু বৈচিত্র্য। শুধু টম্যাটোর চাটনি নয়, পেঁপে দিয়ে প্লাস্টিক চাটনি কিংবা আনারসের চাটনিও রাখা যেতে পারে। আমের শাঁস আর খেজুর দিয়ে তৈরি চাটনিও আমার খুব প্রিয়।

মিষ্টি খুব একটা খাই না। তবু মেনুতে মিষ্টি দই থাকবে। সম্ভব হলে রসমালাই কিংবা রাবড়িও রাখব। সব মিলিয়ে এমন একটা মধ্যাহ্নভোজ চাই, যেখানে বাঙালি রান্নার চেনা স্বাদ থাকবে, আবার অতিথিদের পছন্দ-অপছন্দের দিকটাও মাথায় রাখা হবে।

অনেক বাঙালির কাছে পূজো মানে বাড়ি ফেরা, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো এবং পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া। জীবনের এই পর্যায়ে আপনার কাছে ঘরে ফেরার অর্থ কী? **পাওলি:** জীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে একা, হোটеле হোটেলে। এখনও যেখানে গুটিং করছি, সেখানকার হোটেলেরি থাকছি। বলতে গেলে, সূটকেসেই আমার সংসার! বাড়িতে এলেও অনেক সূটকেস দেখতে পাবেন। কাজের জন্য প্রায়ই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটতে হয় যে!

অনেক দিন বাইরে কাটিয়ে বাড়ি ফিরলে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে মায়ের হাতের মাছের ঝোল আর ভাত। খাবারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই আবেগের একটা যোগ ছিল ‘মাছের ঝোল’ ছবিটি করার পিছনেও। তবে ঘরে ফেরার অনুভূতি সকলের কাছে এক নয়। আমার অনেক আত্মীয়, ভাইবোন ও বন্ধু বিদেশে থাকেন। হয়তো প্রতিদিন বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে থাকার সুযোগ পান না বলেই নিজেদের শিকড়কে আরও সচেতন ভাবে আঁকড়ে ধরেন। যেখানে থাকেন, সেখানেই নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। পৃথিবীর নানা প্রান্তে বাঙালির একজেট হয়ে দুর্গাপূজো করেন। বিষয়টি আমার খুব ভাল লাগে।

আমার কাছে ঘরে ফেরা মানে মনের ভিতর থেকে উঠে আসা একটা ডাক। মনে হয়, বাড়ি ফিরতেই হবে। কলকাতায় আমার জন্ম, এর শহরেই বড় হয়ে ওঠা। তাই কলকাতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নস্টালজিয়াটা একেবারেই আলাদা। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরেছি, নামী হোটেল-রেস্তারায় খেয়েছি। কিন্তু কলকাতার রাস্তার খাবারের কোনও তুলনা হয় না। মোগলুই পরোটা, চপ থেকে ঝালমুড়ি; এখানকার খাবারের বৈচিত্র্য আর নিজস্ব স্বাদ অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

একবার আদুলের সঙ্গে কলকাতার মেরিন ড্রাইভে গুটিং করছিলাম। দুপুরে খাওয়ার সময় পাইনি বলে আমরা বেশ বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। অনেকে পিৎহা বা অন্য কিছু খাওয়ার কথা বলছিলেন। কিন্তু আমাদের সেগুলি খেতে ইচ্ছে করছিল না। আমরা মুড়ি চেয়েছিলাম। ঝালমুড়ি খেতে খেতেই আদুল বলেছিল, কলকাতার ঝালমুড়ি কত ভাল! ছোট্ট এই অভিজ্ঞতাই বুঝিয়ে দেয়, কিছু স্বাদ নির্দিষ্ট জায়গার সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে থাকে যে অন্য কোথাও তা পাওয়া যায় না।

শুধু খাবার নয়, সাহিত্যেরও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, শরৎচন্দ্রের লেখা পড়েই তো আমার বড় হয়েছি। তাঁদের সাহিত্যি আমাদের কল্পনার জগৎ তৈরি করে, জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও গড়ে দেয়। বাংলায় বড় হয়ে ওঠার মধ্যে একটা আলাদা সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা আমি খুব ভালবাসি।



তবে নতুন জায়গায় গেলে সেখানকার খাবার, মানুষ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশে এক মাস গুটিং করেছি। সেখানকার মানুষ ও স্থানীয় খাবার আমাকে মুগ্ধ করেছে। অন্য সংস্কৃতির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু যত দূরেই যাই না কেন, কলকাতায় ফিরে আসার অনুভূতিটা একেবারেই অন্য রকম। দুর্গাপূজো প্রায় দোরগোড়ায়। এ বছরের পূজোর পরিকল্পনা কী? আপনাকে কী ধরনের সাজে দেখা যেতে পারে? **পাওলি:** সত্যি বলতে, আমি খুব বেশি পরিকল্পনা করে চলি না। কারণ, জীবনে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হওয়ার নজির খুব একটা নেই! অনেকেই পূজোর পোশাক থেকে শুরু করে কোথায় দেখতে যাবেন, সব আগে থেকে ঠিক করে রাখেন। আমি একেবারেই সে রকম নই। একমাত্র

সিনেমার পরিকল্পনাই হয়তো ঠিকঠাক করতে পারি! বেশির ভাগ সময় পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই চলি। কোনও শাড়ি দেখে পরতে ইচ্ছে হলে সেটিই পরে নিই। ভাগিস, আমার স্টাইলিস্টরা আছেন! শেষ মুহূর্তে তাঁদের কাছে নানা আবদার করি, আর তাঁরাই সব সামলে নেন। আগেই বলেছি, শাড়ি আমার কাছে শুধু পোশাক নয়, আবেগ ও পরিচয়ের অংশ। তাই যা-ই পরি না কেন, তার মধ্যে নিজের সত্তাকে খুঁজে পেতে চাই। পোশাক আর আমি যেন একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠি। সাজ কখনও আমাকে ছাপিয়ে যাবে না, আবার আমিও পোশাকের নিজস্ব সৌন্দর্যকে স্নান করে দেব না। এই ভারসাম্যটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ বছর কি মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরবেন, নাকি নিজের মতো করে সময় কাটানোর পরিকল্পনা রয়েছে? **পাওলি:** পূজোর সময় কয়েকটি কাজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ রয়েছে। তাই বেশ ব্যস্তই থাকব। এখন আর আগের মতো মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরা হয় না। তবে কলকাতার বাইরে থাকা অনেক বন্ধু পূজোয় আসবেন। তাঁদের সঙ্গে এক-দু’সঙ্গে কাটানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

লেখক: সাংবাদিক

